কোন্নগরের অবনীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি নিয়ে কিছু তথ্য

রথিন চক্রবর্তী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৃষ্টান্ত' নামক এক পাক্ষিকের ১ থেকে ১৫ অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় কোন্নগরের অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে পড়লাম, হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ওই সম্পত্তির ক্রেতা সতীশ লাখোটিয়ার পক্ষ নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'কোন্নগরে যে জমিটাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হেরিটেজ জমি বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভুল... আমি হেরিটেজ কমিটির চেয়ারম্যান। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই জমি হেরিটেজ নয়।'

শুভাপ্রসন্ন আরও বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও দিনও কোন্নগরে থাকেননি। শিল্পীর যখন ৭ বছর বয়স তখন অভিভাবকদের সঙ্গে কোন্নগরে বেড়াতে এসেছিলেন।'

শুভাপ্রসন্ন বাবু আরও অভিযোগ করেন যে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান নাকি প্রমোটারির স্বার্থে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ক্রেতার শুভ প্রচেষ্টাকে (কথাটা আমার) বাধা দিতে চাইছেন।

আমি কোন্নগর নিবাসী এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধি অধ্যাপক। বয়স ছিয়াশি। ছাত্রজীবন থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আমি কোন্নগরের জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি। সেই অধ্যায়েই এই ভবনটির হেরিটেজ হওয়ার সূত্রপাত হয়েছিল। যেহেতু তার সঙ্গে আমারও কিছু সংযোগ ছিল তাই এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারছি না।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত কোন্নগরের কোন লিখিত সর্বাঙ্গীন ইতিহাস ছিল না। ১৯৪৮ থেকে ৫০ সালের মধ্যে 'কোন্নগর প্রকাশিকা' নামে আইডিয়াল সোসাইটি প্রকাশিত পত্রিকায় কিছু টুকরো টুকরো লেখা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া কিছু ক্লাব বা সংগঠন যখন তাদের কোন স্যুভেনির বার করত সেখানে কোন্নগর বিষয়ক কিছু কিছু লেখা থাকত। বই আকারে কোন্নগরের এক মোটামুটি সর্বাঙ্গীন ইতিহাস প্রথম রচনা করেন কোন্নগর নিবাসী, কোন্নগর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষস স্বর্গত রামকৃষ্ণ মহাশয়, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। সেখানে ওই বাড়ি সংক্রান্ত কোন তথ্য ছিল না।

পরবর্তী প্রচেষ্টা হয় ১৯৯৫ সালে। আইডিয়াল সোসাইটি-র (স্থাপিত-১৯৩৬) সমবায় শাখা, 'মিউচুয়াল বেনিফিট ফান্ড' তার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে প্রকাশ করে 'আমাদের কোন্নগর' নামে এক সংকলন গ্রন্থ।

সেই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনার লেখক ছিলেন, কোন্নগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও দাতা, স্বর্গত ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

তারই একটি রচনায় আমি কোন্নগরের পিরালী বাগানের উল্লেখ পাই, যার অবস্থান ছিল উত্তর কোন্নগরের বিশালক্ষী সড়কের পশ্চিমপ্রান্তে, যেখানে পরে হয় লক্ষীনারায়ণ জুট মিল ও পরে কোন্নগর আবাসন (আঃ কোঃ - পৃ.৩০)।

প্রসঙ্গটি নিয়ে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন আলোচনা কালে আমি জানাই, দক্ষিণ কোন্নগরেও তো আর একটি পিরালী বাগান রয়েছে যেটি পিরুলি বাগান নমে সাধারণ্যে উল্লেখিত হয়। উনি বলেন, উনি শুনেছেন বটে তবে সবিশেষ তথ্য তার জানা নেই।

আমার পিতৃদেব স্বর্গত রমনীকান্ত চক্রবর্তী ছিলেন রাজশাহী জেলার নাটোরের লোক। তাঁর কলকাতার কলেজ জীবনের সহপাঠী, কোন্নগরের ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্যের সূত্রে তিনি ১৯২৫ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন ও পরে ১৯৩০ সালে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত তিনি সপরিবারে বাস করেন ওই দক্ষিণ কোন্নগরের জিটি রোডস্থিত এক ভাড়া বাড়িতে যার অবস্থান ছিল ক্রাইপার সাহেবের কুঠির ঠিক উল্টোদিকে। এই ক্রাইপার সাহেব ছিলেন ডি ওয়ার্ল্ড কোম্পানির মালিক। এঁর কুঠি জিটি রোড ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে যার উত্তর সীমায় ছিল পুরাতন বাজার ঘাট ও দক্ষিণ সীমায় ছিল গাবতলা ঘাট। এই গাবতলা ঘাটের গলির দক্ষিণ দিকে ছিল একটা পাঁচিল ঘেরা বাগানবাড়ি।

আমার ছোটবেলায় ওই পাড়ার লোকের কাছে শুনতুম ওটার নাম পিরুলি বাগান। আর বাবার কাছে শুনেছিলুম ওটা কলকাতার ঠাকুর পরিবারের বাগানবাড়ি। সে বয়সে আর বেশি কিছু জানিনি বা বুঝিওনি।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময়ে আমার পিতৃদেব আর জীবিত ছিলেন না। তাই তথ্যটা ঝালাতে আমার বড়দি প্রয়াত জ্যোতির্ময়ী দেবীর শরণাপন্ন হই। উনি আমাকে তার কৈশোর জীবনের এক স্মৃতি উল্লেখ করেন। (জ্যোতির্ময়ী ১৯১৮-২০১৪) পরে সেটি লিখেও দেন তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে (প্রকাশ করেন একুশ শতক নামক প্রকাশনা সংস্থা। নাম - 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' - পৃঃ ১২০)।

ওই বিবরণীর কথা আমি ডাক্তারবাবুকে জানাই। এও জানাই স্বয়ং ইন্দিরা দেবীও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শান্তিনিকেতনে আমার বাবার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তাঁদের কোন্নগরে বেড়াতে আসার কথা বলেছিলেন। (সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৫৯ সালে)।

এই প্রসঙ্গে তারপর আমি অনেকের কাছেই বলি। কোতরং-এর ধাড়শার একটি উৎসাহী সাংস্কৃতিক কর্মী মহম্মদ রফিক ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। এই রফিক আবার কলকাতার বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁদের অনেকেরই তিনি খুব স্নেহধন্য ছিলেন। সেই তালিকায় ছিলেন ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। তাঁর বাড়িতে রফিক মাঝে মাঝেই যেতেন। ডাঃ চন্দ্রও কোন্নগরে বেশ কয়েকবার এসেছেন। রফিক তাঁকে একসময় একথা জানান। আমার সঙ্গে ডঃ চন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯৫ সালে যখন তিনি কোন্নগরে অনুষ্ঠিত হুগলি জেলা গ্রন্থমেলার উদ্বোধনে এসেছিলেন। আমি ছিলাম গ্রন্থমেলা কমিটির সম্পাদক। এরপর তিনি আবার আসেন ২০০২-এ কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরিতে এক স্মরণসভায়। তখন আমি লাইব্রেরির সভাপতি হিসেবে আবার তাঁর মুখোমুখি হই। সঙ্গে সেই পরিচিত রফিক।

ডাঃ চন্দ্র এরপর ২০০৩, ২০০৪-এও কোন্নগরে সভায় আসেন (২৮/৮/২০০৩ ও ৫/৯/২০০৪)।

২০০৭-এর ১লা এপ্রিল কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরির দেড়শো বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা

অনুষ্ঠানে তিনি আবার আসেন উদ্বোধক হিসেবে। সেইদিন দুপুরে মহম্মদ রফিক আমাকে হঠাৎ ফোন করে বলেন, ডঃ চন্দ্র তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন যে তিনি সভায় আসার আগে ওই বাগানবাড়িটি (পিরুলি বাগানের বাড়ি) দেখতে যাবেন। রফিক যেন ওই বাড়ির আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলে ঢোকার ব্যবস্থা করে রাখেন। রফিক আরও জানান ডঃ চন্দ্র আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। দুপুর দুটো নাগাদ আমি সেই মতো ওই বাগানের গেটে উপস্থিত হই। ডঃ চন্দ্র ও রফিক তখনই এসে পৌঁছন। দারোয়ানকে রফিক আগেই সব জানিয়ে রেখেছিলেন। আমরা ওই বাড়ির পুবের একতলার অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেলিং ঘেরা বারান্দার কাছে যেতেই গৃহকর্তা, ওই কারখানার পার্সোনাল অফিসার, ও তাঁর গৃহিনী ডাঃ *চন্দ্রকে সমাদরে সম্ভাষণ করে আপ্যায়ন করলেন ডঃ চন্দ্র ভেতরে ঢোকার আগে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গঙ্গার ঘাটটিও (ভাঙা) দেখালেন* তারপরে ভেতরে ঢুকে আমার কাছে আমার জানার উৎস কি, এবং আমি কি কি জানি সবটা শুনলেন। আমি তাঁকে আমার দিদির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণী দিলাম। দিদি তখন (১৯২৭/২৮ খ্রিঃ) ন-দশ বছরের বালিকা। একটা মেয়েলি ব্রত পালনের জন্যে ওই বাগান থেকে ফুল কুড়োতে গিয়েছিলেন। সঙ্গী ছিল পাড়ার দু-চারটি ওই বয়সী বালিকা। হঠাৎ মালি এসে ওঁদের মালিকের কাছে নিয়ে গেল। সৌম্যকান্তি, দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ ওঁদের কাছে ফুল কুড়োনোর উদ্দেশ্যে ও তাঁরা কোথায় থাকেন সব শুনলেন। তারপর মালিকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে ওঁদের ছেড়ে দিলেন। দিদি বাড়ি ফিরে বাবাকে ঘটনাটি জানালে বাবা বলেছিলেন, ওনার নাম যামিনী গাঙ্গুলি ('যা দেখেছি যা পেরেছি', পৃঃ ১২০)।

আমার জ্ঞানভাণ্ডার ছিল ওই পর্যন্তই ডঃ চন্দ্র বেরিয়ে একথা এখন কাউকে জানাতে বারণ করলেন। তবে জানালেই অবনীন্দ্রনাথের বিবরণের সঙ্গে মিল আছে। তার কিছুদিন পরেই হেরিটেজ কমিশন নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার এসে বাড়ির ভিত-টিত খুঁড়ে বাড়ির বয়স ইত্যাদি নির্ণয় করে যান। মাস দুয়েক পরে ডঃ চন্দ্র আমাকে ও রফিককে জানান বাড়িটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেরই। ওই মীরপাড়া লেনের বাগান বাড়িটি নাকি ঠাকুর পরিবারের এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে উল্লেখিত কোন্নগরের বাগানবাড়ি। উনি আরও জানতে চায়, ওটি কি হেরিটেজ ভবন। আমি যা জানি তাঁকে বলি। চেয়ারম্যানও সেখানে উপস্থিত, ভাইস চেয়ারম্যান অধীর মুখার্জি জানান, ওঁদের দপ্তরে হেরিটেজ কমিশনের কোন বিজ্ঞপ্তি তো নেই।

প্রশ্ন করি, মুশকিলটা কি?

ওঁরা জানান, ওই সম্পত্তির বর্তমান মালিকানা এখন লাখোটিয়া পরিবারের এবং তাঁরা ওখানে মাল্টিস্টোরিড কনস্ট্রাকশনের জন্য প্ল্যান জমা দিয়েছেন মিউনিসিপ্যালিটির অনুমোদনের জন্য।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র সম্পর্কিত সব বিবরণী শোনার পর ওঁরা তখন ঠিক করেন ওঁরা নিজেরাই হেরিটেজ কমিশনে গিয়ে, সব জেনে, তাদের ঘোষণাপত্র নিয়ে আসবেন।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে চলতে থাকে বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের নিরন্তর প্রতিরোধ সংগ্রাম। একদিকে যেমন সরকারি পথে অপরদিকে তেমনি কোন্নগরবাসীকে সচেতন করার পথে চলতে থাকে অবিরত প্রয়াস ওখানে বসানো হয় অবনীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি ও তথ্যপূর্ণ ফলক। প্রকাশ করা হয় বেশ কিছু রচনার অংশ যেখানে ওই বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের দিন যাপনের কিছু বিবরণী আছে। দেখবার জন্য কোন্নগরবাসীর কাছে খুলে দেওয়া হয় ওর দরজা।

আতঙ্কিত লাখোটিয়ারা এর পরে কোন্নগর পুরসভার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এই অধ্যায়ই এখন চলছে যার মধ্যে শুভাপ্রসন্নবাবুর এই হস্তক্ষেপ, অবশ্যই লাখোটিয়াদের পক্ষ নিয়ে, এবং কোন্নগরবাসীর আবেগকে পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত করে। প্রসঙ্গত বলি, শুভাপ্রসন্নবাবু যে জোর দিয়ে বলছেন যে ওই বাড়িটি অবনীন্দ্রনাথের নয়, তিনি ছোটবেলায় শুধু ক'দিনের জন্যে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য যে ১৯২৭-২৮ সালে ওই বাড়িতে তৎকালীন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল যামিনী গাঙ্গুলি।

আমরা অন্য সূত্রে জানি, সাহিত্যিক মণিলাল গাঙ্গুলি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাহ, কন্যা করুণার স্বামী। এঁদেরই পুত্র এবং পুত্রবধূ ছিলেন যথাক্রমে মোহনলাল ও শ্রীমতী মিলাভা গাঙ্গুলি।

মণিলাল মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা যান ১৯২৯ সালে। ১৯২৭/২৮ এ ওই বাড়িতে বোন বৃদ্ধ যামিনী গাঙ্গুলি, মালিক হিসেবে থাকলে এটাই অনুমিত হয় যে ওই বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয় নিশ্চয়ই মণিলাল গাঙ্গুলি সম্পর্কিত কেউ ছিলেন।

তা যদি হয়, তাহলে এটা প্রমাণিত হয় ওই বাড়ির মালিকানা তখন ছিল অবনীন্দ্রনাথের বংশধরদের হাতে।

আমি এখন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু শুভাপ্রসন্নবাবু তো তা নন। তিনি নিজেই কলকাতায় অনুসন্ধান করে এসব তথ্যের সমাহার করতে পারেন। তা না করে তিনি এক ধনী ব্যবসায়ীর পক্ষ নিয়ে এক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছেন। এটাই আশ্চর্য।

লেখক ঃ প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদিয়া

প্রাক্তন সম্পাদক, কোন্নগর আশালতা বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মাঃ)

প্রাক্তন সভাপতি, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম।